সবুজ ইস্তাহার

পরিবেশ নিয়ে ভাবনা

সবুজের অভিযান

বর্ষ : ১ সংখ্যা ২ মার্চ ২০০৯ দাম ২ টাকা

একুশ শতককে পরিবেশ ভাবনার শতক হিসেবে চিহ্নিত করার কথা অনেক বিশিষ্ট মানুষই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছেন। অনেকের ধারণা একুশ শতকে যুদ্ধের অন্যান্য কারণের মধ্যে জলের অধিকার নিয়ে যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল। একদিকে উপকূল এলাকা লোনা জলে ভরে যাওয়ার আশঙ্কায় পৃথিবীর কয়েক কোটি মানুষ দিন গুনছেন। আর ঠিক সেই সময়ে মিষ্টি জলের চাহিদা মেটাতে যুদ্ধের বাতাবরণ সৃষ্টি হচ্ছে। বড় কঠিন সময়। এরকম একটি কঠিন সময়ে ভারতের পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ভারতবর্ষে পরিবেশ বিষয়ক আইনগুলি প্রণীত হলেও তা মূলত দূষণ নিয়ন্ত্রক আইন। কখনোই সামগ্রিক পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সুসংহত পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ ভারতবর্ষে হয়নি। আর তা হয়নি বলেই গঙ্গা শুদ্ধিকরণের সর্ববৃহৎ পরিবেশ বিষয়ক পরিকল্পনার প্রায় গঙ্গাপ্রাপ্তিই ঘটেছে। গঙ্গা প্রাপ্তির এই ঘটনাকে সামনে রেখে নতুন করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'গঙ্গা উপত্যকা রক্ষা কমিটি' তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই পরিকল্পনা কখনোই সার্থক হতে পারে না যদি সামগ্রিক উন্নতির বা বিকাশের পরিকল্পনাতে পরিবেশ ভাবনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া না হয়। ভারতীয় যোজনা কমিশন থেকে রাজ্যস্তরের যোজনা কমিশনগুলি কেউই পরিবেশ নিয়ে বিশেষ চিন্তিত বলে মনে হয় না। আর যেটুকুও চিন্তাভাবনা করেন তার প্রতিফলন অন্যান্য দপ্তরের কাজে কোনরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না।

গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলগুলি দেশের সম্পদ দেশের স্বার্থে কীভাবে ব্যবহৃত হবে সে ব্যাপারে পরিকল্পনা করে কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করেন। এই মুহূর্তে তিনটি অতি জরুরি কর্তব্য আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির সামনে রয়েছে। (১) ভারতের সমস্ত নদীগুলির সম্পর্কে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া যার মূল লক্ষ্য হবে নদীগুলির সজীবতা রক্ষা করা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা। (২) বর্ধিত নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে সৃষ্ট বর্জ্যের পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও তার থেকে সম্পদ সৃষ্টি করে তা পুনর্ব্যবহার করা। (৩) ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা মেটাতে নানা অপ্রচলিত শক্তি বিশেষ করে সৌরশক্তিকে আরও ব্যাপক ভাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া।

দেরিতে হলেও স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রাজনৈতিক দলগুলির কাছে পরিবেশ বিষয়ক সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যাপারে নানান কাজ করার দাবি তুলছেন। এটাই আগামী দিনের নতুন দিশা।

রাজনৈতিক আলোচ্য সূচিতে পরিবেশ ভাবনার আবশ্যিকতা

বিশ্বজিত মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতা উত্তর যুগে পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে খুব বেশি বিকশিত হয়েছে একথা নিশ্চয় কেউ স্বীকার করবেন না। তবে একথা ঠিক ১৯৭২ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলনে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি দারিদ্র্যকে দূষণের অন্যতম শত্রু বলে চিহ্নিত করে সাড়া জাগিয়েছিলেন। বস্তুত প্রথম বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে পরিবেশগত ভাবনা চিন্তার সুস্পষ্ট তফাত তখন থেকেই চিহ্নিত হয়ে যায়। পরবর্তী ক্ষেত্রে তাঁর পুত্র, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি ভারতবর্ষে সর্ববৃহৎ পরিবেশগত উদ্যোগে গঙ্গা শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু তার পরিণতির করুণ অবস্থা সর্বজনবিদিত। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তর থেকে পরিবেশগত ভাবনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের শত্রু হিসেবে দারিদ্র্যের কথা প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে ভারতের বৃহত্তম নদী শুদ্ধিকরণের ব্যর্থতা সহ পৃথিবী জুড়ে ক্ষুধার সূচকে ভারতবর্ষের ৬৬তম রাষ্ট্রের অবস্থান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে পরিবেশ ভাবনা আমাদের কাছে অধরা থেকে গেছে। রাজনৈতিক দলগুলি এই ব্যাপার নিয়ে সরব মন যদিও লোকসভার মাধ্যমে ভারতবর্ষের বহু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেই প্রণয়ন কর্তারা নিশ্চিতভাবেই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সমষ্টিগত চিন্তার ফসল। জলদূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ সহ বিভিন্ন দূষণ নিবারণ সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়েছে, এমনকী মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতবর্ষে পরিবেশ শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়েছে। আইনের আওতাতে জলাভূমি সংরক্ষণ থেকে বনভূমি সংরক্ষণ তথা সমুদ্র উপকূলের জীববৈচিত্র্য রক্ষার ব্যাপারেও একটির পর একটি আইন প্রণীত হয়েছে। কিন্তু এত কিছু আইনের সমাহারেও গঙ্গা সহ ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত নদী দূষণে ভারাক্রান্ত। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে বারবার আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের সরকারকে দূষণ নিয়ন্ত্রণের কাজ না করার জন্য

এর পর দুইয়ের পাতায়

একের পাতার পর

আদালতের কাছে বকুনি খেতে হয়। শহরগুলিতে অবাধে জলাশয় বুজিয়ে ফেলা হয়। গাছ কাটা হয়। যখন খুশি যেমন খুশি মাইক বাজিয়ে শব্দ যন্ত্রণা সৃষ্টি করা হয়। প্লাস্টিক নিয়ন্ত্রণের কথা বেশি না বলাই ভাল কারণ প্রায় অনেকেই ভুলে যেতে বসেছেন প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ নিয়ন্ত্রণে একটি আইন ভারতবর্ষে আছে। বর্ধিত নগরায়ন যে কঠিন বর্জ্য প্রতি মুহূর্তে তৈরি করছে তাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করার আইনী প্রক্রিয়াকরণ বা আইনের অবস্থানের কথা এখনও পর্যন্ত কার্যকারিতার রূপ পেয়নি। পরিবেশের এই হাল-হকিকত সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে। এত কিছু আইনী ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই পাহাড়প্রমাণ ব্যর্থতার কারণ খোঁজাটা আজকে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে পৃথিবী জোড়া আবহাওয়া পরিবর্তনের ধাক্কায় আগামী প্রজন্মের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকাটাই জিজ্ঞাসার চিহ্নের মুখোমুখি।

গণতান্ত্রিক সংসদীয় কাঠামোতে আইনগুলি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে শাসক রাজনৈতিক দল ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের এক অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। শাসকদল ভুল করলে বা সমাজের গুরুতর চাহিদাকে অস্বীকার করলে বিরোধী দলের দায়িত্ব থাকে সমালোচনা-আলোচনা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে শাসকদলকে নিয়ন্ত্রিত করা। পরিবেশ আইনের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে সরকারি বেতনভুক কর্মচারীদেরও দায়িত্ব থাকে। তারা যদি সেই দায়িত্ব পালন না করেন তাদেরও সঠিকভাবে আইনী প্রক্রিয়ায় চলতে বাধ্য করার সামাজিক দায়বদ্ধতা রাজনৈতিক দলগুলির উপর বর্তায়। পরিবেশ আইন কার্যকরী করার অপরিসীম ব্যর্থতা সত্যিই কি রাজনৈতিক দলগুলিকে ভাবায়? আর যদি না ভাবায় তাহলে তার উত্তর খোঁজার সামগ্রিক দায়ভার আমাদের যারা ভোট দিয়ে সরকার গঠন করি।

স্বাধীনতা উত্তর কালে অনেকগুলি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের আগে বা পরে কখনোই পরিবেশ আইনের এই নিদারুণ ব্যর্থতা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে বলে মনে হয় না। একবিংশ শতাব্দীতে পরিবেশের সমস্যা একটি জটিল সমস্যায় পরিণত হয়েছে। শতাব্দীকাল ধরে প্রকৃতিকে অযৌক্তিকভাবে এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে শাসন করে ভোগবাদের চূড়ান্ত আস্ফালনে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করেছে। দেরিতে হলেও সাম্প্রতিক নির্বাচনের প্রাক্কালে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রাজনৈতিক দলগুলির কাছে নির্বাচনী ইস্তাহারে পরিবেশ বিষয়ে তাদের আগামী দিনের কর্মসূচির ঘোষণা দাবি করেছে। রাস্তায় আগামী প্রজন্মের অল্পবয়সী ছাত্ররা রাজনীতির কর্তাদের কাছে পরিবেশ বিষয়ে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করছে। বর্তমান সাধারণ নির্বাচনগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলির পরিবেশ বান্ধব স্ব-ইচ্ছা প্রকাশের দাবি সামাজিক স্তরে ক্রমাগত দানা বাঁধছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় বলতে গেলে নতুন কাল মানুষের কাছে নতুন অর্ঘ্য দাবি করে। যারা জোগান বন্ধ করে দেয় তারা বরখাস্ত হয়। দিকচক্রবালে পরিবেশ দর্শনের ছায়াছবি ভেসে উঠেছে। এই নির্বাচন পরিবেশ বান্ধব ভাবনা চিন্তার দিক উন্মুক্ত করবে এটাই কাম্য।

সবুজের ফিকে রং আর আমরা

রত্নাবতী সে

গাড়ির হর্নে ঘুম থেকে ওঠা। পাতা ঝরা গাছের কঙ্কালের দিকে তাকিয়ে চা খাওয়া। এই সময় যদি এক সবুজ সকালের কথা ভাবি তবে তা হবে আকাশ কুসুম ভাবনা। এমন এক সময় উপস্থিত যখন সবুজ পরিবেশের ছবি দেখে ভাবব এতো স্বপ্নের ছবি। আজকাল কবিতা-গল্পে গাছ, পাতা, ফলের চেয়ে স্কাই স্ক্র্যাপার, মাল্টিপ্লেক্সের রমরমাই বেশি।

১৮৯৬ সালে বিখ্যাত সুইডিস বৈজ্ঞানিক সভান্তে আরহেনিয়াস (Svante Arrhenius) প্রথম আশঙ্কা প্রকাশ করেন ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে জীবাশ্ম জ্বালানির (Fossil fuels) দহনের ফলে উৎপন্ন কার্বনডাইঅক্সাইড পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এতখানি বাড়িয়ে দেবে যার ফলে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটবে। ১০০ বছরেরও আগে হওয়া তাঁর সেই আশঙ্কা আজ আমাদের কাছে আতঙ্ক।

আজকের বায়ু দূষণের কারণ অনেক। গাড়ি, আবর্জনা, কারখানার বিষ ধোঁয়া থেকে নির্গত ধূলিকণা, বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস, এছাড়া পরাগ রেণু ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসও পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। বায়ু দূষণের দুটো অনুষঙ্গ হল ধোঁয়াশা ও অ্যাসিড বৃষ্টি। ১৯৫২-তে লন্ডনে এক শরৎকালে সালফারডাইঅক্সাইড মিশ্রিত কুয়াশা কেড়ে নেয় প্রায় ৪০০০ মানুষের প্রাণ। ধোঁয়াশা হল কুয়াশা ও বিষ ধোঁয়ার মিশ্রণ (smog = smoke + fog)। তাজমহলের স্টোন ক্যান্সারের জন্য দায়ী হল অ্যাসিড বৃষ্টি। সালফারডাইঅক্সাইডের সঙ্গে বাতাস ও জলীয় বাষ্পের বিক্রিয়ায় সৃষ্ট সালফিউরিক অ্যাসিড তাজমহলের মার্বেলের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করে এই ক্ষত। এর জন্য মূলত দায়ী যমুনার অপর তীরে অবস্থিত মথুরা পেট্রোলিয়াম শোধনাগার। সেখান থেকেই নির্গত হয়েছিল এই গ্যাস। শুধু তাজমহল নয়, লিংকন স্মৃতিসৌধ, ক্লিওপেট্রার নিড্‌ল প্রভৃতি স্থাপত্যও আজ ক্ষতিগ্রস্ত। তাজমহলের অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে শস্য, গাছপালার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জীবকুল।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন আজ আর নতুন বিষয় নয়। গ্রিন হাউস এফেক্টে ওজোন স্তর পাতলা হওয়ার ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। কার্বনডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাসঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প, ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের মতো গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর তাপ আটকে দেবার ক্ষমতা আছে। তারা পৃথিবী থেকে বিকিরিত তাপ আটকে দেয় অবলোহিত রশ্মি শোষণের মাধ্যমে। ফলে সেই তাপ আর পৃথিবীর বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না। সেই তাপ আবার আংশিকভাবে ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়। ব্যাপারটি এমন হয় যে কাচ ঘরে ফুল, ফল, সব্জি বা বিশেষ কোন গাছের চাষ করতে যে বিশেষ পদ্ধতিতে (green house process) সূর্যের আলোকে ব্যবহার করে প্রতিফলিত

এর পর তিনের পাতায়

দুয়ের পাতার পর

রশ্মির দ্বারা ঘরটিকে গরম রাখা হয়, যাতে উপযুক্ত উষ্ণতায় গাছগুলো বেড়ে উঠতে পারে। পৃথিবী এ ক্ষেত্রে কাচ ঘরের ভূমিকা পালন করে। ক্রমাগত গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভূ-তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। যার ফলস্বরূপ আবহাওয়ার তারতম্য ঘটছে। ফলে ছয়টি ঋতুর আলাদা আমেজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি আমরা। বাস্তুতন্ত্রেরও ব্যাপক হারে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। পরিবেশের উপর গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর প্রভাব যদি দেখা যায় তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসগুলোর শতকরা ভাগ এমনভাবে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হচ্ছে যা আশঙ্কার কারণ।

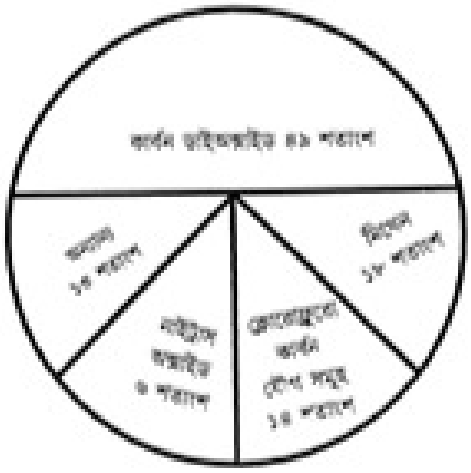

গ্রিনহাউস এফেক্ট জনিত পৃথিবীর উষ্ণতার মাত্রা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন গ্যাসগুলির আপেক্ষিক ভূমিকা

বায়ুমণ্ডলকে তাপমাত্রার তারতম্যের নিরিখে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়, যা আমরা ভূগোল বইতে পড়েছি। তেমনই একটি স্তর হল স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, যেটি ভূ-পৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার ওপর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলে ওজোন গ্যাসের হালকা স্তর রয়েছে সারা পৃথিবীকে ঘিরে। ওজোন স্তর অতিবেগুনি রশ্মি নামক বিপজ্জনক বিকিরণ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে। এ হেন ওজোন স্তরকে পাতলা করে দিচ্ছে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন নামক যৌগ। ফলে আন্টার্কটিকাতে জমাট বরফ গলতে শুরু করেছে, শীতেও গরমের অনুভূতি হচ্ছে আমাদের। এক কথায় পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট করে তা ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছি আমরাই। ব্যাপক হারে পরিবেশ দূষণ-ই এর জন্য দায়ী।

পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় যখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলকেও নাড়িয়ে দিচ্ছে, সেই সময় দাঁড়িয়ে আজ বড় প্রশ্ন হল, একজন প্রকৃত পরিবেশ জ্ঞাপক কীভাবে পরিবেশের ভাবনাকে জনগণের মধ্যে দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে দিতে পারবেন? এমন অবস্থায় যদি গবেষণাগারের বিক্রিয়া পদ্ধতিকে বিদ্যালয় স্তরে শেখানো যায়, তাহলে ছোটরা বিষয়টি সহজে বুঝে আরও দশজনকে জানাতে পারবে। কারণ তারাই হল ভবিষ্যতের প্রতিনিধি। আজকের এই বাজার অর্থনীতির যুগে পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা তথা নির্ভর বিনোদনের মোড়কে উপস্থাপন করা নিয়েও পরিবেশ জ্ঞাপককে ভাবতে হবে। শুধু ছোট পত্রপত্রিকার দ্বারা ব্যাপক ভাবে সম্ভব নয় পরিবেশ সংক্রান্ত বার্তাকে পৌঁছে দেওয়া। এগিয়ে আসতে হবে প্রথম শ্রেণির সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলিকেও। এ ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী লোকমাধ্যমের ব্যবহারও হবে মনোগ্রাহী এবং তথ্যভিত্তিক। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা, গাছ লাগানো, পুকুর পরিষ্কার, জনচেতনা বৃদ্ধি ইত্যাদি তো আছেই। তাছাড়া পরিবেশ বিষয়টি যে কোন খটমট বিষয় নয়, তা সহজ ভাষায় বোঝানো তো আমাদেরই কর্তব্য। তাই নয় কী?

আজ তো ফ্ল্যাটের বিজ্ঞাপনে একটুকরো বাগানের প্রলোভন আমাদের হাতছানি দেয়। নাম না জানা পাখির ডাকে জানলার দিকে তাকাই, তারপর মনে পড়ে এ তো মোবাইলের রিং টোন। মুহূর্তে আনন্দ উবে যায়। এখনও কিছুটা সময় আছে হাজার রঙের মধ্যে সবুজকে ফিরিয়ে আনার। সেই সময়কে কাজে লাগাতে পারলেই ফিরে আসবে পাখির ডাক, সবুজ গাছ আর ঝলমলে সকাল।

সার্বিক পরিবেশ চেতনাই পারে এই গ্রহকে রক্ষা করতে

বেবি বসু (গুপ্ত)

আমাদের একটাই বাড়ি —এই নীলগ্রহ পৃথিবী। এই গৃহেই সজীব বৃক্ষ ও প্রাণীজগৎ লালিত পালিত হয়ে চলেছে কত শত-শতাব্দী ধরে। এই পৃথিবী আমাদের জন্মদাত্রী জননী আর এর অনুকূল পরিবেশ আমাদের ধাত্রীমাতা —দ্বিতীয়া জননী। তাই উভয়ের অবদান সম্পর্কে মানুষকে হতে হবে সচেতন।

আমাদের সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহগুলি যেন একটি অঞ্চলের প্রতিবেশীদের বাড়ি, কিন্তু তাতে নেই শ্যাম-শষ্প বনানী, না আছে আলাপচারিতার জন্য প্রাণবন্ত মুখর জীবকুল। তাই প্রায় ছশো কোটির বেশি মানুষের আবাসস্থল এ পৃথিবী যেন নির্জন, নির্বান্ধব একাকী এক গৃহ। এই গ্রহের জানালা দিয়ে আমরা কথা বলতে পারি না প্রতিবেশী গ্রহান্তরের কারোর সঙ্গে। তাই প্রাণীজ সম্পদে সমৃদ্ধ একটাই পৃথিবী, একটাই মানবজাতি, একটাই সুমহান ভূ-রাষ্ট্র — যাতে সমগ্র মানবজাতির প্রত্যেকের বসবাসের পূর্ণ অধিকার। আর তার চারপাশে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব থেকে বৃহৎ নীলতিমি। কিম্বা ক্ষুদ্র তৃণ থেকে মহীরুহ পর্যন্ত সকলের সাহচর্যে যেখানে বাস্তুতান্ত্রিক (Ecosystem) ভারসাম্য হয়ে থাকবে সুরক্ষিত। তাই ভূ-মণ্ডলের (Earth's system) সকল উপমণ্ডল (Sub-system) যথা বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, অশ্মমণ্ডল ও জীবমণ্ডলের একত্রিত অবস্থানে রচিত হয়েছে একটি বাস্তুতান্ত্রিক বলয় —যার যা নিজস্বতা, তাই নিয়ে গড়ে উঠেছে তার পরিমণ্ডল বা পরিবেশ যা মানুষের অনবধানতায়

এর পর চারের পাতায়

তিনের পাতার পর

আজ হয়ে পড়েছে বিপন্ন।

পৃথিবী প্রকৃতই সম্পদশালী। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তথা সমগ্র জীবকুলে রয়েছে মহামূল্যবান সম্পদের আকর। অনুসন্ধিৎসু মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে করে চলেছে তার অন্বেষণ, আবিষ্কার, উদ্ভাবন, ব্যবহার ও সমৃদ্ধি। ধরিত্রী মাতা তাঁর সন্তানদের জন্য এই সম্পদে রেখেছেন সমান অধিকার। অশুভ শক্তি তাকে বারবার অসম অধিকারে সৃষ্টি করে ভ্রাতৃ কলহ। ফিরে ফিরে আসে শক্তির উম্মাদ রূপ। যুদ্ধ-হানাহানি, লোভ-লালসায় পর্যুদস্ত হয় মানবাধিকার। সম্পদের কাড়াকাড়িতে বিনষ্ট হয় প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ। বিনষ্ট হয় অমূল্য সম্পদ। যা দিতে পারে নিঃশ্বাসের প্রাণবায়ু, তা হয়ে পড়ে দূষিত। যে জলের অপর নাম জীবন, সেই হয়ে পড়ে জীব-নাশক।

পৃথিবীর ভূমিগত অবস্থানে রয়েছে যে সকল মহাদেশ ছিল, তা একদিন ছিল একটাই মহাদেশ রূপে (Pangaea) আর মহাসাগরগুলির একটিই রূপ (Panthalassa) যা প্রাকৃতিক ও ভৌত কারণে পৃথক হয়েছিল জীব সৃষ্টির বহু লক্ষ বছর আগে। পরবর্তীকালে মানুষেরই গবেষণায় জানা যায় কী বিচিত্র প্রক্রিয়ায় আজকের পৃথিবীর রূপটি ধারণ করেছে। এক একটি মহাদেশ যেন একটি বাড়ির বিভিন্ন কক্ষ বা ঘর। একটি আদর্শ বাড়ির প্রতিটি ঘরই যেমন পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য থাকে, তেমনই পৃথিবীর সব মহাদেশের পরিবেশই সুরক্ষিত থাকা দরকার, না হলে এই পৃথিবী রূপে গৃহের সৌন্দর্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। গৃহের একটি কোণ দূষিত হলে অপর অংশও অচিরেই মালিন্যযুক্ত হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে আজকের দুনিয়ায় তথাকথিত রাষ্ট্রনায়কদের সে বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। অন্যথায় পরিবেশ রক্ষায় পরিবেশবিদগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। রাজনীতি ও অর্থনীতির নিরিখে বিভাজিত দুটি বিপরীত ধর্মী শক্তি — একদিকে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলির ধন-শক্তি, আর অপর দিকে অনুন্নত উন্নয়নশীল দেশগুলির জনশক্তি। উন্নত জীবন যাপনের অর্থনৈতিক মানকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে দূষণ অবধারিত রূপে বেড়ে চলেছে। প্রযুক্তিগত উন্নতিও তার রাশ টেনে রাখতে অপারগ। অপর দিকে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে অক্ষম দেশগুলির দূষণ মুক্তির হাতিয়ার বা পদক্ষেপ অনেকাংশেই অপরিপূর্ণতায় ব্যাধিগ্রস্ত। এই উভয় দলের মেরুকরণের ফল হল পারস্পরিক দোষারোপ, দায়িত্ব এড়ানো —যার চাক্ষুষ প্রমাণ 'বসুন্ধরা সম্মেলন' (Earth's summit) এর অনিবার্যভাবে অসফলতার ইঙ্গিত। পরিবেশ ভাবনা যদি মানুষের মনে শৈশব থেকেই গড়ে তোলা যায়, তবে সহজেই জানা যাবে যে পৃথিবীর এক প্রান্তের দূষণ অন্য প্রান্তকে রেহাই দেয় না। জানা যায় অ্যান্টার্কটিকার ঊর্ধ্বগগনে কেন দেখা দিয়েছে ওজোন গহ্বর (Ozone hole), কেনই বা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আকাশে ঝুলে থাকে বাদামি মেঘ (Asian Brown Cloud) বা ওজোন স্তরের ক্ষীণায়ন (Ozone Depletion) অনুবর্তী মানুষেরই কর্মফল —— যা সমগ্র জীবকুলকে বিনষ্টির দিকে নিয়ে চলেছে।

মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায় আমরা সকলেই যদি কিছুটা পরিবেশ সচেতন হতে পারি তবেই আসন্ন বিপদ-ভাঙনের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারি। পৃথিবীর উষ্ণায়নকে (Global warming) প্রতিরোধ করতে পৃথিবী জুড়ে কমাতে হবে জীবাশ্ম জ্বালানির অতি ব্যবহার। দেখতে হবে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির প্রাকৃতিকভাবে নির্দিষ্ট শতকরা হার থেকে যেন তা কোনওভাবেই বিপদসীমা লঙ্ঘন না করে। অক্সিজেন- কার্বন ডাইঅক্সাইড ভারসাম্য পৃথিবীর জীবকুলকে করুক সুরক্ষিত। মাতা ধরিত্রীর প্রথম সন্তান যে শস্য-শ্যামল বৃক্ষকুল আপন খাদ্য উৎপাদন করে সকল জীবজগতকে করে চলে নীরব সেবাদান, তাকে রাখতে হবে বাঁচিয়ে। প্রতিদিনই হয়ে উঠুক আমাদের গাছ লাগানোর দিন —— বৃক্ষ দিবস । তারই পদতলে বসে আমরা নেব শপথের অঙ্গীকার —— কেমন করে বাঁচবো, আর বাঁচাবো অন্য সবাইকে। এই সবুজায়নে প্রতিরোধ করব পৃথিবীর উষ্ণায়নের আসন্ন বিপদ, সুরক্ষিত করব পৃথিবীর তুষার ভাণ্ডার। ধরিত্রীকে অতিখরা, অনাবৃষ্টি থেকে রক্ষা করব, অম্ল-বৃষ্টির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করব 'জৈব-অজৈব' সকল সম্পদকে। এই বিশ্বময় কর্মযজ্ঞে সকল মানুষকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে নির্দ্বিধায় এগিয়ে আসতে হবে।

পরিবেশ সচেতনতা বৃহত্তর ও সার্বিক রূপ লাভ করলে সচেতন মানুষই দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ে তুলবে। তখন সবুজায়নই হবে আমাদের ইস্তাহারের শিরোনাম।

মোবাইল কি একটা প্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক বস্তু?

অভিষেক সাহা

প্রশ্ন ১ : সারাদিন অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকব, ইন্ডিয়া-নিউজিল্যান্ডের ওয়ান ডে-এর ক্রিকেট আপ ডেট জানব কী করে?

প্রশ্ন ২ : পরশু দিন সিনেমা দেখতে যাব কিন্তু হলে যাওয়ার সময় নেই, অ্যাডভান্স টিকিট কাটব কী করে?

প্রশ্ন ৩ : অমলবাবু বাজারে বেরিয়ে যাওয়ার পর ওনার স্ত্রীর মনে পড়ল পোস্ত আনতে বলতে ভুলে গেছেন, কী হবে এখন?

দশ বছর আগে হলে বলতে হত কিছু করার নেই। আর এখন একটা ক্লাস সিক্সের ছেলেকে বা মেয়েকে জিজ্ঞেস করুন, সেই আপনাকে বলে দেবে উত্তর — কেন মোবাইল আছে না। বহু সমস্যার একটাই সমাধান - মোবাইল। দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষা হোক বা স্বাস্থ্য— ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিচের ভেদাভেদ ভুলে পৌঁছতে পারেনি সবার কাছে সমান ভাবে। মোবাইল পেরেছে।

যোগাযোগ মানচিত্রে মোবাইল যে একটা নতুন পথের দিশা দিয়েছে তা বোধহয় সকলেই স্বীকার করবেন। দূর-দূরান্তের আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করাই হোক, আপৎকালীন অবস্থায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়াই

এর পর পাঁচের পাতায়

চারের পাতার পর

হোক কিংবা এস এম এস-এর মাধ্যমে একে অপরের কাছাকাছি পৌঁছানোই হোক — এ মুহূর্তে মোবাইলের কোনও বিকল্প নেই। আর শুধু কী তাই, নতুন সিনেমার হিট গান কিংবা প্রিয় নায়ক-নায়িকার ছবি লোড করা, পছন্দের দৃশ্যকে মোবাইল ক্যামেরায় বন্দি করে রাখা, ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করা, আরও কত কী! আক্ষরিক অর্থেই পুরো পৃথিবীটা চলে আসে হাতের মুঠোয়।

এ পর্যন্ত পড়ে মনে হতে পারে, মোবাইলের বোধহয় কোনও ক্ষতিকারক প্রভাব নেই। যে সব সমস্যা আমরা সাধারণভাবে জানি, যেমন — হার্টের সমস্যা, সাময়িক বা চিরস্থায়ী বধিরতা, পুরুষদের শুক্রাণু উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়া ইত্যাদি। সম্প্রতি সমালোচনার জন্য সবুজ মুখোপাধ্যায়ের 'মোবাইল — একটি চলমান বিপদের ধারাবিবরণী' বইটি পড়েছিলাম। বইটিতে মোবাইলের বিপদ সম্বন্ধে বেশ তথ্যবহুল আলোচনা রয়েছে। তবে আমি একটু অন্য দিকে দেখব। উন্নত প্রযুক্তির মোবাইল স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে গিয়েছে। বাবা-মা তাঁদের চিন্তা লাঘবের জন্য সন্তানদের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেন। সন্তানদের বাড়ির বাইরে যাওয়া থেকে ফেরা পর্যন্ত বাবা-মার চিন্তা থাকা স্বাভাবিক। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য মোবাইল তুলে দেওয়াটাও হয়তো স্বাভাবিক কিন্তু সে মোবাইলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা বাবা-মায়েদের হাতে থাকে না। কিছু স্কুলে হয়তো নিয়ম করে স্কুলের ভিতর ছাত্রছাত্রীদের মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু স্কুলের বাইরের জগতে এর ব্যবহার কে নিয়ন্ত্রণ করবে। মোবাইল তো এখন শুধু খবর বিনিময়ের মাধ্যম নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। মোবাইল কোমল মনের ছাত্রছাত্রীদের কাছে নিয়ে আসে এক অচেনা পৃথিবীর সন্ধান। যে পৃথিবী তাদের কাছে অনেক বেশি রোমাঞ্চকর, অনেক বেশি আকর্ষণীয়। পড়াশুনা, খেলাধুলা কিংবা অন্য বিষয়কে পাশে রেখে তারা মেতে ওঠে এর ব্যবহারে। তারা বুঝতেও পারছে না যে বিষ বাষ্প ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে তাদের শরীরে, মনে। সবার অলক্ষ্যে নবীন প্রজন্ম ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে এক অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে। একথা বলছি না যে মোবাইল না থাকলেই সব ভাল হয়ে যাবে কিংবা মোবাইল যখন ছিল না তখন সব ভাল ছিল। তবে মোবাইলের উপস্থিতি যে সেই এগিয়ে চলায় পজিটিভ ক্যাটালিস্ট-এর কাজ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই নবীন প্রজন্মের কাছে মোবাইল নিষিদ্ধ করা পুরোপুরি সম্ভব না হলে অন্তত নিয়ন্ত্রণ করা অবশ্যই দরকার। তা না হলে মোবাইল ফোন কিংবা এর তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ থেকে সৃষ্ট রোগের থেকে হয়তো বা আমরা কোনও দিন মুক্ত হব কিন্তু নবীন প্রজন্ম যদি শারীরিক এবং মানসিকভাবে পুরোপুরি এর দ্বারা আক্রান্ত হয় তা থেকে বেরিয়ে আসা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট কঠিন হবে। তাই, বর্তমান প্রেক্ষাপটের বিচারে মোবাইলকে একটা প্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক বস্তু ছাড়া অন্য আর কী-ই বা বলা যেতে পারে।

ভারতের জল সংকট— অনাগত প্রজন্মের কাছে অশনি সংকেত

শৌভিক রায়

কথায় বলে, জলই জীবন। দুই অক্ষরের এই রাসায়নিক পদার্থেই নিহিত আছে পৃথিবী নামক গ্রহে বসবাসকারী সবরকম প্রাণীর জীবনীশক্তি। এই ভূপৃষ্ঠের ৭১ শতাংশই জল। এর মধ্যে আবার ৯৭ শতাংশই সাগর-মহাসাগরের লবণাক্ত জল। অবশিষ্ট ২.৪ শতাংশ হিমবাহ ও দুই মেরু প্রদেশের সঞ্চিত বরফস্তূপ। আর ০.৬ শতাংশ জায়গা জুড়ে আছে নদী, হ্রদ, খাল-বিল ও পুকুর। ভূ-সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ এবং উৎপন্ন পদার্থকে বাদ দিলে সিংহভাগ জলসম্পদই আটকা পড়ে আছে বরফ ঢাকা মেরুপ্রদেশ, হিমবাহ অথবা মিষ্টি জলের বিভিন্ন উৎস সমূহে। তাহলে ব্যাপারটা এটাই দাঁড়াচ্ছে যে পৃথিবীতে সঞ্চিত জল সম্পদের মাত্র তিন শতাংশই পেয় জলের তালিকাভুক্ত। তবে চিন্তাটা এখানেই। কারণ, জল এখন দুষ্প্রাপ্য সঞ্চিত সম্পদের তালিকায় নাম প্রায় লিখিয়ে ফেলেছে। মানুষেরই নানা অজ্ঞতার কারণে দিনে দিনে বাড়ছে ভূ-নিম্নস্থ জলের সংকট। একটি হিসাব দেখাচ্ছে যে ২০২৫ সাল নাগাদ ভারতে মাথাপিছু ব্যবহার্য জলের পরিমাণ ৫০০০ ঘনমিটার থেকে কমে হবে ১৫০০ ঘনমিটার। জলের ধারাবাহিক অপচয় বিষয়ে এখনই সচেতন হবার বিষয়ে ভারতকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করে দিয়েছে ইউনাইটেড নেশনস।

বিশুদ্ধ জলই যে কোনও সভ্যতার দীর্ঘদিন টিকে থাকার প্রধান অবলম্বন। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যে, সুমার, মেসোপটেমীয় বা অতি উন্নত সিন্ধু সভ্যতা — সবেরই আকস্মিক পতনের পিছনে যথেচ্ছ হারে বন সম্পদ ধ্বংসের ফলশ্রুতিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার মত বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়েছিল। নগর সভ্যতার বিস্তার ঘটাতে গিয়ে সে সময়ের মানুষ পরিবেশ রক্ষার উপযোগিতাকে উপেক্ষা করেছিল। যার ফল তারা হাতে-নাতে পেয়েছিল। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রগতি তথা প্রযুক্তির চরম উন্নতির লগ্নে পৌঁছে মানুষ তো পরিবেশ ধ্বংসের পথেই এগোচ্ছে। ভূনিম্নস্থ জল সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহার ক্রমে পানীয় জলের সঞ্চয় ভাণ্ডারকেই নিঃশেষ হবার পথে ঠেলে দিচ্ছে। অথচ, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখনও এই বিপদের বিষয়ে কার্যত উদাসীন।

২০০৬ সালে জাতিসংঘ প্রদত্ত প্রতিবেদন দেখিয়েছে যে 'পৃথিবীতে সঞ্চিত জল সম্পদের মাথাপিছু বরাদ্দ যথেষ্টই আছে।' তবে একই সঙ্গে এই জল সম্পদ কীভাবে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদার অনুপাতে পানীয় জলের অপর্যাপ্ত সরবরাহ। দ্বিতীয়ত, কৃষিক্ষেতে জলসেচের নিমিত্ত যথেচ্ছ হারে অগভীর জলকূপের মাধ্যমে সঞ্চিত জল সম্পদের নিষ্কাশন। তৃতীয়ত, জলের অপব্যবহার এবং যথেষ্ট জলদূষণ জৈববৈচিত্র্য রক্ষায়

এর পর ছয়ের পাতায়

পাঁচের পাতার পর

ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। চতুর্থত, জল সম্পদের অধিকার নিয়ে আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব অনেক ক্ষেত্রে জলযুদ্ধ বাধিয়ে দিচ্ছে। পঞ্চমত, কারখানার বর্জ্য ও ময়লা জল নিষ্কাশন দিনে দিনে পানীয় জলের উৎস সমূহের ভবিষ্যতকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলছে। নগর সভ্যতার দ্রুত প্রসার অরণ্য সম্পদকে সমূলে বিনাশ করছে। এরই ফলশ্রুতিতে ভারতে বার্ষিক বৃষ্টি পাতের গড় পরিমাণ অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আর অনিয়মিত বৃষ্টিপাতই পানীয় জলের সঞ্চয় বৃদ্ধি না পাওয়ার অন্যতম কারণ।

পানীয় জলের ভাঁড়ারে টান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জলবাহিত রোগের প্রকোপ। পৃথিবী জুড়েই ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরিসংখ্যান আশংকাজনক ভাবে বেড়ে গেছে। আর এই রোগে শিশু মৃত্যুর হারও বাড়ছে। ভারত সহ পৃথিবীর যে কোনও দেশের হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসাধীন রোগীদের ৫০ শতাংশ জলবাহিত রোগে আক্রান্ত। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ৮৮ শতাংশ রোগের জন্য দূষিত পানীয় জল, অপরিচ্ছন্ন জল নিকাশি ব্যবস্থা এবং খারাপ খাদ্য দায়ী। এমনিতে বৃষ্টিপাত বণ্টনে সামঞ্জস্যহীনতা দেখা দিলেই খরা দেখা দেয়। তবে মানুষের জনসংখ্যা দিন দিন অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাবার কারণেই বৃষ্টিহীনতা বা খরা এখন স্বাভাবিক প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। এজন্যই রাষ্ট্রসংঘ সাম্প্রতিক জল সংকটের জন্য মানুষের নির্বুদ্ধিতা ও সচেষ্টতার অভাবকেই দায়ী করেছে।

পরিষ্কার, বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রতিটি প্রাণীর হাজারও প্রয়োজন মেটায়। দিল্লিতে অবস্থিত সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট-এর অধিকর্তা সুনীতা নারায়ণ বলেছেন যে 'জাতি হিসেবে আমরা যদি ধনী বা গরিব হতে চাই তাহলে সবার আগে চাই জল সম্পদের যথেষ্ট সঞ্চয়।' তবে সাম্প্রতিক সময়ে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে উদ্বৃত্ত খাদ্য সম্পদ উৎপন্ন করার তাগিদের পাশাপাশি গ্রাম ও শহরের চাহিদায় সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে চাপ পড়ছে সঞ্চিত জল সম্পদের ওপর। অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা ক্ষুণ্ণ রাখার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার প্রতিযোগিতায় মানুষ এখন জেরবার। ফলে, পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। একটি সমীক্ষা দেখিয়েছে যে ২০২৫ সালের মধ্যেই ভারত সহ মোট ৪৮টি দেশের ২.৮ বিলিয়ন জনসমষ্টি চূড়ান্ত জল সংকটের সম্মুখীন হবে। রাষ্ট্রসংঘ সতর্ক বার্তা দিয়ে দিয়েছে যে এমনটা চলতে থাকলে পানীয় জলের সংকট হয়ে উঠবে জীবন ধারণের পক্ষে অন্যতম এক বাধা। সেক্ষেত্রে জলের অভাবে বর্ধিত জনসংখ্যার নিমিত্ত কৃষিকার্যই থেমে যাবে। সেক্ষেত্রে দারিদ্র তো বাড়বে, তার সঙ্গে পরিবেশও হয়ে উঠবে দূষিত।

ভারতের সাম্প্রতিক জনসংখ্যা ১,১২৯,৮৬৬,১৫৪। বিশ্বে চিনের ঠিক পরেই জনসংখ্যার নিরিখে ভারতের স্থান। বিশ্বের মহাশক্তিধর দেশ আমেরিকার তুলনায় এই পরিমাণ ৩০৫ গুণ বেশি। তাহলেই ভাবুন। এদিকে এই বিপুল জনসংখ্যার কারণে অসম চাপ পড়ছে দেশের সঞ্চিত সম্পদের ওপর। দারিদ্র তো গত ৫০ বছর ধরেই ভারতের একটা সার্বিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। বর্ধিত জনসংখ্যার নিরিখে দেশের কৃষিক্ষেত্রে ফলন বাড়াতে সঞ্চিত জল সম্পদের অধিকাংশই সেচখাল এবং অগভীর নলকূপের মাধ্যমে ব্যয়িত হয়ে যাচ্ছে। নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহে দেশে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তবে দেশের সর্বত্র পানীয় জলের ঠিকঠাক সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক-এর হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে ভারতে অন্তত ২১ শতাংশ সংক্রামক রোগ ছড়ানোর ক্ষেত্রে অনিরাপদ পানীয় জল-ই দায়ী। এদেশে শুধু কলেরা রোগেই দৈনিক ১৬০০ প্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। অথচ জেট প্লেন দুর্ঘটনার কারণে মারা যায় ৮ জন ব্যক্তি।

এ দেশে স্বাস্থ্য সচেতনতার সার্বিক মানও খুব একটা উন্নত নয়। বহুল প্রচারিত বিভিন্ন গণমাধ্যমে অহরহ প্রত্যেক বাড়িতে পাকা পায়খানা বানিয়ে নেবার কথা বলা হয়। এজন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হয়। অথচ, এদেশে বিভিন্ন রাজ্যের প্রত্যেক স্তরের গ্রামগুলিতে বাথরুম ব্যবহারের অভ্যাস নেই বললেই চলে। এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে ভারতে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৪ শতাংশ এই অভ্যাসে অভ্যস্ত। প্রতিবার খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়ার বিষয়েও অধিকাংশ মানুষই সচেতন নয়। এই অভ্যাসহীনতা থেকেই ছড়াচ্ছে বিভিন্ন জলবাহিত রোগ। অথচ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে দেশে পানীয় জলে দূষণের কারণে মৃত্যুর সার্বিক হার কমাতে বাথরুম ব্যবহার এবং নানাবিধ স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রসার আবশ্যিক পদক্ষেপ হওয়া উচিত।

সঞ্চিত জল সম্পদের পরিমাণ ক্রমশ কমছে। শুধু ভারত নয়, যে কোনও উন্নত দেশেই এটা এখন অন্যতম সমস্যার রূপ নিয়েছে। তাই বিশেষ করে বিগত এক দশক ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়াস শুরু হয়েছে। পানীয় জলের উৎসগুলিকে এখনও যদি নিরাপদ করে তোলার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ না গ্রহণ করা হয় তাহলেই সমূহ বিপদ। এক সমীক্ষায় জানানো হয়েছে যে ২০২৫ বা আরও পরে বিশ্বের অন্তত অর্ধেকের বেশি মানুষ জল সংকটের সম্মুখীন হবে। এটাকেই ইউনাইটেড নেশনস 'জল সংকট' নামে চিহ্নিত করেছে। বলা বাহুল্য, বিশ্ব অর্থনীতিতে জল সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কারণ শিল্প উৎপাদনের পাশাপাশি পণ্য পরিবহনে জলপথের বিশেষ ভূমিকা আছে। দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদার পাশাপাশি নিরাপদ পানীয় জোগান থাকাটা অতি আবশ্যক। এটা সকলেই মানে ও জানে। সঞ্চিত জল সম্পদের অন্তত ৭০ শতাংশই কৃষিক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়ে যায়। তাহলে, জীবন ধারণের অন্যতম এই উপাদানকে নিয়ে এবার অন্তত আমরা সচেতন হব তো।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক : পরিবেশ আকাদেমি, সবুজের অভিযান, বড়বাজার, চন্দননগর - ৭১২১৩৬। সম্পাদক : রাহুল রায়।
যোগাযোগ : ৯৪৩৩৫৭৫৩৬৪; ই-মেল : rayrahul2263@yahoo.co.in